



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 819 - 826

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দেহজ্ঞানতত্ত্ব ও প্রতিবাদী আধ্যাত্মিকতা : বাংলায় লোকায়ত প্রতिसংলাপ হিসেবে বাউল গান এবং ‘মনের মানুষ’-এর অস্তিত্ব-তত্ত্ব

সৌমী রায় চৌধুরী

Email ID: soumee150@outlook.com

 0009-0002-8214-7075

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Baul Song,
Baul Philosophy,
Lokayata
Epistemology,
Body-Centered
Knowledge,
Counter-
Religious
Discourse,
Moner Manush,
Folk Mysticism.

Abstract

This paper presents a critical analysis of the philosophical, cultural, and historical underpinnings of Baul songs as a unique folk tradition of Bengal. It approaches Baul music not only as a musical tradition but as a medium of expression of a particular religious-philosophical group whose *weltanschauung* is based on the experience of the body, love, and reality. The core of this analysis is the Baul idea of the ‘Moner Manush’ (the ‘Man of the Heart’), which represents the realization of the immanent deity through the disciplined development of the human body and not through temple-based religiosity or scriptural traditions. This analysis locates the Baul philosophy within the larger paradigm of lokayata (folk or worldly) culture and philosophy, tracing its affinities with the Charvaka school of thought in its rejection of scriptural authority, the caste system, and metaphysical thinking. At the same time, it emphasizes a significant difference between the two: whereas the philosophy of Charvaka is largely restricted to materialism, the philosophy of the Bauls translates the primacy of the body into a mystical and internal spiritual inquiry.

The article also delves deeper into the syncretic basis of Baul philosophy, exemplifying how Buddhist Sahajayana, Nath yogic techniques, Vaishnava devotion, Tantric symbolism, and Sufi mysticism are integrated in Baul songs. Using metaphorical expressions such as boats, birds, houses, and mirrors, Baul songwriters express their esoteric knowledge while avoiding dogmatic formalism. Based on literary, philosophical, and folkloristic traditions, the article argues that Baul songs represent a ‘living continuum’ of the humanistic spiritual traditions of India. Finally, it locates Baul music in the realm of ‘folk mysticism’ that integrates the body and the transcendent, thus providing a profoundly inclusive and humanistic alternative to institutionalized religion in the cultural history of Bengal.

Discussion

বাউল একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়। সেই ধর্মের একটি নির্দিষ্ট দর্শন আছে; আছে নির্দিষ্ট সাধন পদ্ধতি এবং সাধকদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা তাদের সাধনপদ্ধতি, জীবন দর্শন ও জীবনভিজ্ঞতাকে যে

গানে ব্যক্ত করেছেন, তাই বাউল গান। এই ঘরানার গান বাংলার নিজস্ব লোকায়ত গান। লোকায়ত গান হিসেবে বাউল গান স্বীকৃত হলেও, বাউল গানের আরও একটা পরিচয় আছে; এই গান হল ভাবের গান। এখানে ভাব বলতে মূলত প্রেম-ভাবের কথাই বলা হচ্ছে, যা ‘মনের মানুষ’-এর প্রতি নিবেদিত হয়ে থাকে। এই মনের মানুষের প্রতি প্রেম নিবেদনই বাউল গানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাউল সাধনার ভিত্তি হচ্ছে মানুষের দেহে পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করা। বাউলরা মনে করেন, মানুষের শরীরই পরম সত্য অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্র। তাই তারা মন্দির বা অন্য কোনো বাহ্যিক উপাসনায় আগ্রহী নন।

বাউল দর্শনে দেহের গুরুত্ব অনেক। বাউলরা বলেন, যা এই দেহে নেই, তা ব্রহ্মাণ্ডেও নেই। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সব রহস্য মানুষের শরীরেই বিদ্যমান। বাউলদের এই দর্শন উপনিষদের বাণীর সাথে মেলে, তবে তারা একে জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেন। এই দেহভিত্তিক দর্শন আসলে সমাজের প্রচলিত ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ।

বাউলদের দেহসাধনা সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিয়ম ও সংযম। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, ইন্দ্রিয় সংযম, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং গুরুর দেখানো পথে চলা— এগুলো এই সাধনার অংশ। এই কঠিন সাধনার অভিজ্ঞতা তাদের গানে প্রকাশ পায়, তবে সরাসরি নয়, রূপকের মাধ্যমে। কারণ তাদের মতে, তত্ত্ব খোলাখুলি বললে তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা নদী, নৌকা, পাখি, ঘর— এসব ব্যবহার করেন দেহের ভেতরের কথা বোঝানোর জন্য।

লালন ফকিরের গানে এই দেহভাবনা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি দেহকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে নৌকায় চড়ে একজন সাধক সংসারের বাধা পেরিয়ে সত্যের দিকে এগিয়ে যায়। আবার, খাঁচার ভেতরের অচিন পাখি দিয়ে তিনি দেহ আর মনের সম্পর্ক বুঝিয়েছেন।

সুতরাং, বাউল সাধনায় দেহ কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং মুক্তির পথ। বাউলরা মনে করেন, মানুষের শরীরেই পরমাত্মা বাস করেন। তাই তারা জাতিভেদ ও সমাজের নিয়মকানুন মানেন না। তাদের গান হলো এই দর্শনের প্রকাশ। বাউলরা সহজ ভাষায় যে কথা বলেন, তা গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন। এখানে মানুষ নিজের দেহের মাধ্যমেই পরমাত্মার সান্নিধ্য পেতে পারে। এই দেহকেন্দ্রিক সাধন পদ্ধতি বাউল দর্শনকে লোকসংস্কৃতিতে আলাদা জায়গা দিয়েছে।

এর পরবর্তীতে এই নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এই বিশেষ ঘরানার লোকায়ত গানের, অর্থাৎ বাউল গানের শিকড়ের সন্ধান। বাউল গানের উৎস সন্ধান করতে গেলে অনিবার্যভাবেই আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতি ও লোকায়ত চিন্তাধারার পরিসরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। কারণ বাউল গান কোনো অভিজাত বা শাস্ত্রনির্ভর সংগীতধারা নয়; এর জন্ম, বিকাশ ও প্রকাশ সবই সাধারণ মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে আশ্রয় করে। লোকজ সমাজের মাটিতে দাঁড়িয়েই এই গানের ভাব, ভাষা ও দর্শন নির্মিত হয়েছে।

‘লোকায়ত’ শব্দটি উচ্চারিত হলেই যে দর্শনধারার কথা প্রথমেই স্মরণে আসে, তা হল প্রাচীন ভারতের অন্যতম নাস্তিক মতবাদ- চার্বাক দর্শন। ‘লোকায়ত’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘লোকেসু আয়ত’ অর্থাৎ যা লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই অর্থেই লোকায়ত দর্শন কোনো আকাশচারী তত্ত্ব নয়, বরং ইহজাগতিক বাস্তবতার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক জীবনদর্শন। লোকায়ত চিন্তাধারায় এই দৃশ্যমান জগৎই একমাত্র সত্য; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো পরলোক বা অতিলৌকিক সত্তার অস্তিত্ব এখানে স্বীকৃত নয়।

বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকের লেখায় ‘লোকায়ত’ ধারণার ব্যাখ্যা নানাভাবে পাওয়া যায়। যেমন— “The view held by the common people”^১ কথাটির মাধ্যমে লোকায়তকে সাধারণ মানুষের সহজ, অপ্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার “The system which has the base in common profane world”^২ ব্যাখ্যাটি লোকায়ত দর্শনের ইহজাগতিক চরিত্রকে স্পষ্ট করে — এখানে পার্থিব জীবন, দেহ, খাদ্য, সুখ-দুঃখই মুখ্য বাস্তবতা। অন্যদিকে, “The philosophy that denies that there is any world other than this one,”^৩ এই সংজ্ঞাটি লোকায়ত চিন্তার নাস্তিক ও পরলোকবিরোধী অবস্থানকে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে। এই সব ব্যাখ্যার মধ্যেই লোকায়ত দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়— ইহজাগতিকতা, দেহকেন্দ্রিকতা এবং শাস্ত্রগত কর্তৃত্বের প্রতি সংশয়।

বাউল গানের সঙ্গে এই লোকায়ত চিন্তার সম্পর্ক এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাউল সাধকেরাও যেমন শাস্ত্র, আচার ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে জীবন ও সত্যকে উপলব্ধি করতে চান, তেমনি লোকায়ত দর্শনও বেদ-উপনিষদ, যাগ-যজ্ঞ ও পরলোকতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে ধরে। বাউল গানে দেহ, মন, প্রেম, ক্ষুধা, বেদনা— এসবই তত্ত্বের ভাষা হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গি লোকায়ত ধারার সঙ্গে তাদের গভীর আত্মীয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যও লক্ষণীয়। চার্বাক দর্শন যেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় সুখ ও ইহজাগতিক বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ, বাউল দর্শন সেখানে দেহকেন্দ্রিক হয়েও এক অন্তর্জাগতিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তবু উভয়ের মিল এই যে— দু'ক্ষেত্রেই সত্যের সন্ধান আকাশে নয়, মানুষের মধ্যেই। এই মিলের কারণেই বলা যায়, বাউল গানের শিকড় লোকায়ত ধারার মধ্যেই প্রোথিত, যদিও তা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক রূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছে। লোকায়ত সংস্কৃতির এই মানবকেন্দ্রিক ভাবনাই বাউল গানকে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে একস্বতন্ত্র ও গভীর দার্শনিক তাৎপর্য দিয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে আস্তিকরা কতগুলো বিষয়ে বিশ্বাস রাখেন, যেমন - ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব, আত্মার স্বতন্ত্রতা, কর্মফল, পুনর্জন্ম, মোক্ষ ও বেদের অপ্রাস্ত্যতা। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন এই বিশ্বাসগুলো মানে না। তারা এগুলোকে সরাসরি বাতিল করে দেয়। এটা শুধু কিছু সংশয় নয়, বরং একটা ভিন্ন দার্শনিক অবস্থান। চার্বাকরা মনে করেন, যা দেখা যায় না বা প্রমাণ করা যায় না, তা বিশ্বাস করার কোনো মানে নেই। তাই বেদ, উপনিষদ বা পুরাণের ওপর ভিত্তি করে যে পরম তত্ত্বের কথা বলা হয়, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ সেগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না।

চার্বাক দর্শনের মূল কথা হল— ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরি দেখাই জ্ঞানের একমাত্র উপায়। তারা অনুমান বা শব্দ প্রমাণকে সন্দেহের চোখে দেখে। কারণ এগুলো প্রত্যক্ষের ওপর ভরসা করলেও ভুল হতে পারে। তাই তারা আকাশ বা ব্যোম নামক কোনো তত্ত্বকে স্বীকার করে না। চার্বাকদের মতে, এই জগৎ তৈরি হয়েছে মাটি, জল, আগুন ও বাতাস— এই চারটি জিনিস দিয়ে। এর বাইরে অন্য কিছু ভাবা অপ্রয়োজনীয়।

চার্বাকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হল চেতনা বিষয়ক ধারণা। তারা মনে করেন, চেতনার উৎস আত্মা নয়, বরং আমাদের দেহ। দেহের বিশেষ গঠনের ফলে যেমন মদ তৈরি হয়, তেমনি দেহের বিশেষ গঠনের কারণে চেতনার জন্ম হয়। তাই জীবন এবং চেতনা আলাদা কিছু নয়। শরীর ধ্বংস হলে চেতনাও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আত্মার অমরত্ব বা পুনর্জন্মের ধারণা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ কারণে চার্বাক দর্শন পরলোক বা মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে না। তাই স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য — এসব ধারণা ভিত্তিহীন। এগুলো আসলে ভয় দেখিয়ে সমাজকে চালানোর কৌশল। তারা ধর্মীয় কাজ, যজ্ঞ, ব্রত বা সাধুদের জীবনযাপনকে সন্দেহের চোখে দেখে। চার্বাকরা মনে করেন, পুরোহিতরা পূজা-পার্বণ করেন মূলত নিজেদের পেট চালানোর জন্য। ধর্ম এখানে একটা ব্যবসা, যা মুক্তির পথ দেখায় না।

লোকায়ত দর্শন সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বেদের শ্রেষ্ঠত্বকে মানে না। তারা জন্মগতভাবে কেউ উঁচু বা নিচু — এই ধারণাকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, মানুষ যেহেতু শরীর দিয়ে গঠিত, তাই তার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত শারীরিক সুখ। তাই স্বর্গের আশায় বর্তমান জীবনকে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে নেই। পার্থিব সুখ, আরাম, সম্পদ ও ভোগ — এগুলোই জীবনের স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়া।

এই দর্শন একটি জনপ্রিয় উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়— ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত’,^৪ অর্থাৎ ঋণ করে হলেও ঘি খাও, কারণ শরীর পুড়ে গেলে আর ফিরে আসার সুযোগ নেই। অনেকে এই কথাকে ভোগবাদী মনে করেন। তবে এটা আসলে চার্বাক দর্শনের বাস্তববাদী চিন্তাকেই তুলে ধরে।

এজন্য চার্বাক দর্শন হল একটি মানবকেন্দ্রিক ও বাস্তববাদী জীবনদর্শন। প্রকৃতি ও পার্থিব জীবনই এর মূল ভিত্তি। এই দর্শন পরবর্তীতে বাউলদের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছে। বাউলরা যদিও চার্বাকদের মতো পুরোপুরি নাস্তিক নন, তবুও তারা শাস্ত্রের বিরোধিতা করেন, দেহকে কেন্দ্র করে সত্য জানতে চান এবং ধর্মের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন। এসব দিক থেকে লোকায়ত দর্শনের প্রভাব তাদের মধ্যে দেখা যায়।

যেকোনো দর্শন বা জীবনযাত্রার মতো, অতিরিক্ত স্বাধীনতা লোকায়ত চিন্তনে কিছু সংকট তৈরি করে। জীবনে নিয়ম ও নৈতিকতার চেয়ে ভোগবিলাস প্রধান হয়ে উঠলে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ে। লোকায়ত সমাজেও এমনটা দেখা যায়। এর সঙ্গে দুর্নীতির মতো বিষয় যুক্ত হয়ে লোকায়ত দর্শনের মানবতাবাদী দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চার্বাক দর্শনের যুক্তিবাদিতার জায়গায় ভোগবাদিতার বিস্তার ঘটে, এমন অভিযোগ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

‘চার্বাক’ নামের অর্থ হাস্যপূর্ণ কথা। এই কারণে লোকায়ত দর্শন অনেকের কাছে সন্দেহের পাত্র ছিল। শুধু বৈদিক বিশ্বাসীরা নয়, বৌদ্ধ, জৈনসহ অন্য দার্শনিকরাও লোকায়তদের সমালোচনা করতেন। বৌদ্ধ ও জৈনরা মনে করতেন, লোকায়ত দর্শন নৈতিকতাহীন। বৈদিকরা তাদের শাস্ত্রবিরোধিতাকে সমাজের খারাপ দিক হিসেবে দেখতেন। ফলে লোকায়তদের নিজস্ব কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না, বিরোধীদের সমালোচনা থেকেই এই দর্শন সম্পর্কে জানা যায়।

চারপাশের সমালোচনা ও সামাজিক চাপে মানুষের মনে পরিবর্তন আসে। অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ শান্তি ও আশ্রয় খোঁজে। তারা বেদ ও সনাতন দর্শনে সেই আশ্রয় পায়, যেখানে আত্মা, কর্মফল ও মুক্তির কথা বলা হয়েছে। মানুষ আত্মায় শান্তি খুঁজে ফেরে। ক্ষণস্থায়ী ভোগের চেয়ে মুক্তির ভাবনা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তখন আদর্শবাদী চিন্তা আবার প্রতিষ্ঠা পায়। ব্যাসের মতো চিন্তাবিদরা ধর্ম ও নৈতিকতার পথে জীবনের অর্থ খোঁজার কথা বলেন। লোকায়তদের কেউ কেউ এই আদর্শবাদী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হন। অনেকে মনে করেন, দার্শনিক দিক থেকে তারা পরাজিত হয়েছিলেন। তবে ভোগবাদী দর্শন সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

এভাবেই বৈদিক ভারত পরিবর্তিত হয়। যাগযজ্ঞের বদলে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে। দেবতা, পূজা, মন্ত্র ও নানা ধরনের উপাসনা একসঙ্গে প্রচলিত হয়। তান্ত্রিক ভারত একসময় ভারতীয়দের জীবনদর্শন হয়ে ওঠে। এখানে আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ভোগবিলাস— দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। লোকায়ত দর্শনের কিছু ধারণা এখানে নতুন রূপে টিকে থাকে, যেখানে নাস্তিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা মিশে যায়।

এ কারণে বলা যায়, লোকায়ত দর্শন শেষ হয়ে যায়নি, বরং এর রূপান্তর ঘটেছে। সমালোচনা ও সমাজের পরিবর্তনের কারণে লোকায়ত দর্শন আদর্শবাদী কাঠামোর মধ্যে মিশে গেছে। ভারতীয় দর্শনের এই পরিবর্তন বাউলদের মতো লোকায়ত-আধ্যাত্মিক ধারা তৈরিতে সাহায্য করেছে।

ভারতে যেমন রয়েছে বিদ্বানদের জন্য রচিত দর্শন শাস্ত্র, তেমনিই সাধারণের জন্য রয়েছে অতীন্দ্রিয় কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন। এছাড়াও গুঢ় রহস্যজনক জনপ্রিয় দর্শন রয়েছে কবিতায় এবং তার অতীন্দ্রিয় প্রকাশে। প্রেম বা ‘ইস্ক’-ই সেখানে প্রধান। আর এখানেই এসেছে সহজ কবির কথা যার পথ হল প্রকৃতি তথা সহজের পথ, যা হৃদয়ের সরল অনুভূতির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই তত্ত্বজ্ঞানী সাধকেরা আত্মসাক্ষাতের কথা বলে আসছেন। পরম প্রকৃতির সঙ্গে জীবের অভেদ কল্পনায় যে অদ্বৈত-বোধের সৃষ্টি হয়, তাই মিস্টিসিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদের মূলকথা। অস্মিতার বোধকে লুপ্ত করে জীবের আধ্যাত্মিক উত্তরণে এই অতীন্দ্রিয় অনুভবের সৃষ্টি হয়। বাউল সাধনায় এই মনের মানুষের সন্ধানই সূক্ষ্ম মরমিয়াভাবের দ্বারা বেষ্টিত।

এই অতীন্দ্রিয়বাদ বা মিস্টিসিজম-এর সাথে কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকটি ধর্মেই কিছু অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকের সন্ধান পাই, অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে এই অতীন্দ্রিয়বাদের বিরোধও লক্ষ্য করা যায়, ইতিহাস ঘাটলে এই ঘটনা বিরল নয়। আসলে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই একটি সূক্ষ্ম মরমিয়া বোধ রয়েছে, যা তাকে ইন্দ্রিয়াতীত কিছু বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। মরমিয়া সাধকেরা সেই ইন্দ্রিয়াতীত বোধের দ্বারা চালিত হন। বাংলার বাউল সাধকেরাও তাঁদের গানে সেই সূক্ষ্ম মরমিয়া ভাবের স্মরণ ঘটিয়েছেন।

বাউল সাধকেরা দেহস্থিত পরমাত্মাকে ‘মনের মানুষ’ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তাদের মতে আত্মা মানব দেহকে অবলম্বন করে বাস করেন, মানবদেহের সাধনার দ্বারাই তিনি লভ্য। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন—

“এই মানুষ অলক্ষ্য অবস্থায় হৃদয়ে বা মনে অবস্থান করিতেছেন, বোধ হয় এই কল্পনা করিয়া তাকে ‘মনের মানুষ’ বলিয়াছেন।”^৫

শুধু ‘মনের মানুষ’ নয়; কখনও কখনও ‘সহজ মানুষ’, ‘অধর মানুষ’, ‘সোনার মানুষ’ প্রভৃতি নামেও তাকে অভিহিত করেছেন। বাউল সাধকদের সূক্ষ্ম মরমিয়া চেতনায় এই মনের মানুষের বিভিন্ন রূপ ও তার সাধনার উপলব্ধি বাউল গানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

মনের মানুষের রূপ-বর্ণনায় বাউল সাধকেরা অনেক ‘Metaphor’-এর ব্যবহার করেছেন, যেমন লালনের বিখ্যাত ‘আমি একদিনও না দেখিলাম তারে’ গানটিতে মানবদেহকে ‘বাড়ি’, আরাধ্যকে ‘পড়শি’ এবং আমাদের দেহস্থিত অন্তঃস্থলকে ‘আরশিনগর’ উপমায় উপমিত করেছেন লালন। দেহের মধ্যেই দেহাতীতের বাস, সেই দেহাতীত দুর্লভকে লাভ করাই সাধকের সাধ্য। কিন্তু সে বস্তুর সন্ধান সহজ নয়, কাছে থেকেও সহজে ধরা দেয় না সে—

“গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরলী পারে—
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।”^৬

এই দুর্গমতা অতিক্রমের জন্য চাই সাধনা। সাধনা দ্বারাই সেই আড়শি নগরের পড়শির সাথে মিলন সম্ভব। আবার সেই পড়শির ‘হস্ত-পদ-স্কন্দ-মাথা’^৭ নেই, অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ ভারহীন। আড়শি বা আয়নায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব ভারহীন হয়, তেমনি আমাদের আরশিনগরের পড়শি ভারহীন অর্থাৎ তার রূপ নিরাকার, এও এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিই বটে। অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকেরা পরমাত্মাকে বিশ্বের প্রতিটি অনুতে বিদ্যমান বলে মনে করেন, তেমনি লালনের বর্ণনায় মনের মানুষেরও সর্বত্র বিচরণ। তাই সে ক্ষণেক থাকে ‘শূণ্যের উপর’ আবার ‘ক্ষণেক ভাসে নীরে’।

আবার স্বভাব বাউল গগন হরকরার গানে আমরা দেখি ‘মনের মানুষ’-কে লাভ করার আকুতি—

“আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে—
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।”^৮

একজন স্বভাব বাউল তথা কবির মিস্টিক চেতনার অনন্য উদাহরণ এই গানটি। কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তিনি নন, তিনি এক ব্যক্তি মানুষ। তার নিজস্ব মরমিয়া বোধ তাকে ‘মনের মানুষ’-এর সন্ধানের পথে নিয়ে গেছে। ‘মনের মানুষ’ -এর সন্ধানে তিনি এতটাই আকুল যে তিনি লিখেছেন—

“ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।”^৯

সেই পরমাত্মা তথা মনের মানুষের সন্ধানই তাঁর জীবনের একান্ত কাঙ্ক্ষিত। প্রেমের চরম মূল্য না দিলে সেই কাঙ্ক্ষিত ধন উপলব্ধ হয় না। তবু তার সাথে বিচ্ছেদে গগনের মন কাঁদে। আর এখানেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার আর্তি ফুটে উঠেছে গগনের গানের মধ্যেও।

এই বাউল গানগুলির ক্ষেত্রেও যেমন প্রেমই প্রধান, তেমনি বাউল গানের পূর্ববর্তী বেশিরভাগ দর্শনগুলিতে প্রেমই রয়েছে কেন্দ্রবিন্দুতে। এই ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে প্রচলিত ‘প্রেমের মাধ্যমে মুক্তি’-র তত্ত্বটি স্মরণযোগ্য। জৈন, ভাগবতবাদী এবং শৈবরাও সেই ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছিলেন।

এর কিছু পরেই লক্ষ্য করা যায় ভারতের পশ্চিম দুয়ার দিয়ে সুফিসন্তদের হাত ধরে প্রবেশ করছে ইসলাম তথা ইসলামের সাম্যের বাণী, লোক দর্শনের বাহক হয়ে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা ফকির, দরবেশদের কথা সাধারণ মানুষ অতি সহজেই আত্মস্থ করেছে। সিন্ধু অঞ্চলে ইসলাম-সুফি, হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্রিত হয়ে সুফিদের দরগায় ভজনা করেছেন। ঠিক একই ভাবে বাংলায় সহজের সাধনায় আউল-বাউল, দরবেশ, ফকির, সাঁই, কর্তাভাজারা ভজনা করেছেন এই সহজিয়া বা সহজ সাধনার মাধ্যমে। সহজ হল একটি পন্থা, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম। বাউল গানেও গানগুলির ভাবনার শিকড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে প্রেম।

বাউল গানের ক্ষেত্রে আর একটি দিক মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী, যে বাউল শুধুমাত্র গান নয়; এই বাউল সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রয়েছে দেহতত্ত্বের সাধনা। দেহ সাধনার এই পন্থা বঙ্গের সংস্কৃতিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই জড়িয়ে রয়েছে। বাউল শব্দের বুৎপত্তি নিয়ে বেশ কিছু অভিমত প্রচলিত আছে, তার মধ্যে একটি অভিমত এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণযোগ্য। অনেক গবেষক মনে করেন যে, ‘বায়ু’ শব্দের সাথে ল-প্রত্যয় যোগ করে বাউল শব্দের উদ্ভব। যোগ-সাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ুর গ্রহণ ও নির্গমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। কুম্ভক, রেচক, পূরক — যোগ সাধনার তিনটি পরিভাষা; এতে নাসিকা পথে শ্বাস গ্রহণ, শ্বাসরোধ ও শ্বাস ত্যাগের প্রক্রিয়া জড়িত। লালন শাহ তাই বলেছেন তাঁর রচিত একটি পদে—

“আগে জান হাওয়ার স্থিতি,
কোথায় হাওয়ার উৎপত্তি,
কোথায় হাওয়ার গতগতি।”^{১১}

তিনি আরও বলেছেন, “হাওয়া রূপে এই দেহে আল্লা আসে আল্লা যায়।” ‘বাউল’ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে আরও একটি মতো প্রচলিত আছে। তাঁদের মতে, আরবি ‘আউল’ (أول) শব্দের দোসর হিসেবে বাউল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আউল-বাউল শব্দগুচ্ছ জনসমাজে বহুল প্রচলিত। ইসলামের সুফি ঘরানার একটি সাধক সম্প্রদায় ‘আউলিয়া’ নামে পরিচিত। বাউল গানেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—

“এই ফুলের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ডটা,
কেউ আউল, কেউ বাউল।”^{১২}

আউল ভিন্নভাবে উচ্চারিত হলেও যে তারা সকলে একই পথের পথিক তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সুফিধারায় ‘বাবাল’ নামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে; এরাও খোদার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। বাউল শব্দের উৎপত্তি এখান থেকেও হতে পারে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। ‘ব্রজকুল’ থেকে ‘বাজুল’ এবং তা থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে বলেও পরবর্তীকালে কিছু গবেষক মতপ্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও এই বজ্রযান, বজ্রতত্ত্ব, বজ্রকুল ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলায় রচিত চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের ফসল। চর্যাপদের ভাব, তত্ত্ব ও প্রকরণের সঙ্গেও বাউল গানের অনেক মিল রয়েছে। এই জন্য বাউল গানকেও কেউ কেউ বৌদ্ধ সাহিত্য বলে মনে করতেন। অবশ্য বাউল ভাবনার সঙ্গে সুফি-দর্শন, বৈষ্ণব-দর্শন এবং নাথপন্থা এমনভাবে মিশে আছে যে বাউল গানের ক্ষেত্রে এই দর্শনগুলির অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

বাউল গান যে খুব অর্বাচীন নয় তা মালাধর বসু রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ (১৪৭৩-১৪৮০) কাব্যের একটি অতিরিক্ত পাঠের লিখিত উল্লেখই বোঝা যায়—

“মুকুল (ত) মাথায় চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।”^{১৩}

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও বাংলার বাউল সম্প্রদায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় দেখিয়েছেন, বাউলের ধর্ম-সাধনার সুর বেদেও মেলে। তাঁর এই অভিমত যে কতখানি যুক্তিপূর্ণ এবং সর্বোপরি সত্য, তা বোঝা যায় অথর্ববেদ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই। মানুষ যেহেতু ব্রহ্মের পুর তথা মন্দির, তাই তার নাম পুরুষ। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে ‘পুরংযো ব্রহ্মণো বেদ’।^{১৪} দেহভাণ্ড কেন এবং কীভাবে তা ব্রহ্মাণ্ড, তার কথাও প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়— “তস্যং হিরণ্যঃ কোনাঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ।”^{১৫} বাউল ভাবনার মূল কথাই যে বেদে প্রতিফলিত তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই বাউলতত্ত্ব-এর ধর্মার্থ কিংবা ভাবনা যাই বলি না কেন; তা যে চিরন্তন মানবসত্ত্বের ভাব-ভাবনার ওপর যুগ-যুগান্তর ধরে ধারাবাহিকভাবে সংস্কৃতির নানান প্রথাগত পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি, মহাভারতের ভীষ্মের উক্তিও বাউল ভাবনার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই— “ন মানুষাত্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।”^{১৬}

বাউল গান কবে শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত আছে। কেউ বলেন, এর শুরু সহজিয়া বৌদ্ধ বা তান্ত্রিকদের হাত ধরে। আবার কারো মতে, বৈষ্ণব সহজিয়া ধারাই এর উৎস। কেউ কেউ সুফিবাদের প্রভাবের কথাও বলেন। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, বাউল গান তার নিজস্ব দর্শন দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে বাংলার মানুষের জীবনে এর একটা গভীর প্রভাব আছে। শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, মানুষের জীবন, ভালোবাসা ও নিজের পরিচয় নিয়ে ভাবনার ক্ষেত্রেও বাউল গানের প্রভাব দেখা যায়।

বাউল গানের দর্শন অনেক পুরনো ঐতিহ্য থেকে এসেছে। বৈদিক, উপনিষদ, বৈষ্ণব বা তান্ত্রিক দর্শনের প্রভাব যেমন এখানে আছে, তেমনি লোকায়ত দর্শনের চিন্তাভাবনাও মিশে আছে। এখানে শরীরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, শাস্ত্রের কঠিন নিয়মকানুন মানা হয় না, জাতিভেদ মানা হয় না এবং মানুষকে ভালোবাসা হয়। এগুলো লোকায়ত ধারার বৈশিষ্ট্য। তবে বাউল দর্শন শুধু নাস্তিকতার কথা বলে না, এটি মানুষের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তাকে একসঙ্গে মেলায়।

বাউল গানের বিশেষত্ব হল, এটি শুধু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গম্ভীর আলোচনা করে না। এটি ধর্মের কঠিন নিয়ম মানে না, আবার শুধু ভোগবিলাসের কথাও বলে না। বলা যায়, এই গান মানুষের ভেতরের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করে। মানুষের আনন্দ, কষ্ট, প্রেম, বিচ্ছেদ, সন্দেহ আর খোঁজার কথা— সবই বাউল গানে পাওয়া যায়। তাই এই গান মানুষের মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছে এবং তাদের মনের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে।

এই কারণে বাউল গান শুধু সাধকদের মধ্যে আটকে থাকেনি, এটি সাধারণ মানুষের জীবনেও ছড়িয়ে গেছে। লোকসংগীত থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য, নাটক, গান ও ছবিতেও বাউল গানের প্রভাব দেখা যায়। কবিতা, গান, দর্শন এবং বিভিন্ন আন্দোলনে বাউল গানের নতুন রূপ দেখা যায়। এর ফলে বাউল গান একটি বড় সাংস্কৃতিক জগৎ তৈরি করেছে, যা শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানবিক ও সুন্দর একটা ঐতিহ্য।

এজন্যই বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাউল গান খুব দ্রুত বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু বা হৃদয়ের গান হয়ে উঠেছে। এটা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের গান নয়, এটা মানুষের সাধারণ অনুভূতির গান। এই কারণেই বাউল গান অন্যান্য লোকসংগীত থেকে আলাদা। এর গভীরতা, প্রতীকী ব্যবহার এবং জীবনের কাছাকাছি থাকার কারণে বাউল গান একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল, বাউল গানের যে আবেদন, তা অন্য কোনো বাংলা গানের ধারায় এত বেশি দেখা যায় না। বাউল গান সময় ও স্থানের বাধা পেরিয়ে মানুষের ভেতরের প্রশ্নগুলোকে ছুঁতে পারে। আর এই কারণেই বাউল গান শুধু একটি লোকগান নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতির একটা অংশ।

Reference:

1. Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*. Vol. 1, Cambridge UP, 1922. Page no. 55
2. Chattopadhyaya, Debiprasad. *Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism*. People's Publishing House, 1959. Page no. 3
3. Radhakrishnan, Sarvepalli. *Indian Philosophy*. Vol. 1, George Allen & Unwin, 1927. Page no. 279
4. Bhattacharya, Ramkrishna. *Studies on the Cārvāka/Lokāyata*. Anthem Press, 2011. Page no. 41
5. Bhattacharya, Upendranath. *Banglar Baul O Baul Gan*. Firma KLM, 1964. Page no. 12-13
6. Lalon Shah. *Lalon Geeti*. Sahitya Samsad, 1966. Page no. 52
7. Lalon Shah. *Lalon Geeti*. Sahitya Samsad, 1966. Page no. 52
8. Harkara, Gagan. *Baul Sangraha*. Various Kolkata editions consulted.

৯. Harkara, Gagan. *Baul Sangraha*. Various Kolkata editions consulted.
১০. Lalon Shah. *Lalon Geeti*. Sahitya Samsad, 1966. Page no. 55
১১. Lalon Shah. *Lalon Geeti*. Sahitya Samsad, 1966. Page no. 55
১২. A verse preserved in oral circulation, not traceable to a fixed manuscript tradition.
১৩. Basu, Maladhar. *Sri Krishna Vijaya*. 15th-century text, Calcutta University Press, 1944. Page no. 214
১৪. Griffith, Ralph T. H., translator. *The Hymns of the Atharva Veda*. 2 vols., E.J. Lazarus & Co., 1895-96
১৫. Griffith, Ralph T. H., translator. *The Hymns of the Atharva Veda*. 2 vols., E.J. Lazarus & Co., 1895-96
১৬. Vyasa. *The Mahabharata*. Critical ed., Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933-1966

Bibliography:

- Bhattacharya, Upendranath. *Banglar Baul O Baulgan*. Kolkata, Orient Book Company, 1964.
- Gangopadhyay, Subodh. *Lokasangit Bibhor*. Vol. 1, Pharma KLM Pvt. Ltd., 1998.
- Gangopadhyay, Subodh. *Lokasangit Bibhor*. Vol. 2, Pharma KLM Pvt. Ltd., 2001.
- Gangopadhyay, Subodh. *Lokagiti Bichitra*. Howrah, Bangiya Sangeet Parishad, 2005.
- Islam, Dr. Mazharul. *Folklore: Parichiti O Pathan-Pathan Pathok*. Dhaka, Bangla Academy, 1967.
- Islam, Sheikh Mokbul, editor. *Lokosanskritibijnan: Shikor-er Sandhan*. Kolkata, Bangiya Sahitya Sansad, 2007.
- Islam, Sheikh Mokbul. *Lokasangitbijnan: Tattwa O Rupayan*. Kolkata, Bangiya Sahitya Sansad, 2008.
- Sengupta, Pallab. *Lokosanskritir Simana O Swaroop*. Kolkata, Pustak Bipani, 2018.
- Sen, Kshitimohan. *Bharatiya Madhyayuger Sadhonar Dhara*. Kolkata, Visva-Bharati, 1953.
- Tagore, Rabindranath. *Bauler Gan*. Kolkata, Visva-Bharati Granthan Bibhag, 1968.